সংকলিত মুর্খভাষ্য

বিচ্ছিন্নতার আন্তরিক দর্শন

অনিরুদ্ধ রাহা

পুনশ্চ

মূর্খের জবানবন্দী - নির্বোধের বিচ্ছিন্নতা বোধ

"তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে" , চাণক্য আজ এক প্রাক্তন বিশ্ববীক্ষা মাত্র। ক্রমাগত কথা বলছি আমরা। কথা বলছি, এ কথা যতটা প্রত্যয় নিয়ে বলতে পারবো, ঠিক ততটা প্রত্যয় নিয়ে অপরের বলা কথা শুনছি, এ কথা বলতে পারবো কি? সংশয়। তবু কথা বলছি। বাড়িতে বলছি, বাজারে বলছি, পথে বলছি, ঘাটে বলছি, সোশ্যাল মিডিয়ায় বলছি, সভায় বলছি, সমিতিতে বলছি, এমনকি শ্মশানেও বলছি। কথা বলাই এখন মূর্খের শোভা। যদিও দার্শনিক হ্বিটগেনস্টাইন নিজে নিঃশব্দে দূরে থেকে মাঝে মাঝে সরব হয়ে শব্দজাত অর্থহীনতার বিষয়ে সাবধানবাণী উচ্চারণের দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন, তবু কথা বলছি আমরা। অর্থেও বলছি, অনর্থেও বলছি। কারণ কথা বলাই নাকি সামাজিক হয়ে ওঠার একমাত্র অস্ত্র। শব্দজাত অর্থহীনতাই সমাজে টিঁকে থাকার কবজ-কুন্ডল।

কিন্তু সামাজিক হয়ে ওঠার জন্যে এতো আকুলতা কেন? ছোট্টোবেলায় মাস্টারমশাই শিখিয়েছিলেন, "ম্যান ইজ এ সোশ্যাল অ্যানিমাল"। বড়ো হয়ে মনে হলো কোনটা বেশি? সোশ্যাল, নাকি অ্যানিমাল? নাকি সোশ্যাল-অ্যানিমাল এক বিবর্তিত নব-প্রজাতি, যার জীবনবিজ্ঞান আদতে মরণ এবং মারণ-বিজ্ঞান? আর ম্যান কেন? ওম্যান কোথায় গেল? তারা কি সোশ্যাল-এর সংজ্ঞার বাইরে ? পন্ডিত বলবেন, ম্যান মানে মানব-প্রজাতি, তার মধ্যে ওম্যান-ও ধরা আছে। কিন্তু তবুও সংশয় যায় না মূর্খের, ধরা যদি আছেই, তাহলে "ওম্যান ইজ এ সোশ্যাল অ্যানিমাল" বলে না কেন কেউ? কোন কারাদন্ডে দণ্ডিত সে? তবে কি বাক্যটির জন্ম এমন কোনো মানচিত্রের অভ্যন্তরে যেখানে নারী চিত্রায়িত হন না? মাস্টারমশাই জানাননি। কিন্তু কেমন করে যেন জানতে পেরেছিলাম মহাদার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, "Man is by nature a social animal"। পন্ডিত বললেন, মূর্খ তুমি, প্রজাতি বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দেও নারী-পুরুষের বিভাজিত মানচিত্রের তত্ত্ব খাড়া করছ! মূর্খই বটে। শব্দের অভ্যন্তরে কোথায় লুকিয়ে থাকে বিভাজনের বীজ, সে অর্থহীন ভাবনা না ভেবেও তো দিব্যি মানুষ সর্বার্থে সামাজিক। সমাজ সচেতনও বটে; ফেয়ারনেস ক্রিম প্রসাধিত জনতা, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ জানায় জর্জ ফ্লয়েড-এর মৃত্যুর। কথা বলা যখন নিজেকে বিজ্ঞাপিত করার বাসনায়,

তখন বিজ্ঞাপনের ধর্ম মেনে, যা খুশি বলা যায়। ওসব মুখের কথা, মনের কথা নয়। মানুষ বুদ্ধিমান জীব। মনের কথা মুখে উচ্চারণ কদাপি নয়!

কিন্তু, বৃহদারণ্যক উপনিষদ (প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ, চতুর্থ শ্লোক) যে বলেছিল, "স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ"। তাহলে তো মুখনিঃসৃত বাক্যের সঙ্গে মনের সংযোগ জানতেন প্রাচীন প্রজ্ঞা । আধুনিক বিজ্ঞানেও পলিগ্রাফ যন্ত্রে ধরা পড়ে বিভ্রান্তিকর বাক্যের সত্য-মিথ্যা। বাক্য গঠন হয় মনে । তবে কি মনের গভীরে কোথাও থেকে গেছে ম্যান-ম্যানিয়া? আর সেই ম্যানিয়াতেই কি আধিপত্য বিস্তার-বাসনায় বিভাজনের শুরু? বিভাজনই অধিপতির আয়ুধ? এবং অতঃপর বিচ্ছিন্নতার উদ্রেক? মূর্খ বড়ো অসহায়। তার তো মনের কথাই মুখে। কে তাকে দর্শন করাবে কি প্রকৃত সত্য, আর কি নির্মিত সত্য!

বিভাজনের সত্য, বিচ্ছিন্নতার সত্য জানতে তবে কি আমরা ভ্রাম্যমাণ হব গ্রামে গ্রামে আর শহরে শহরে? বিচ্ছিন্নতার অনুভবের উৎস কি মূলত শাহরিক ? শাহরিক বিচ্ছিন্নতা-ব্যাধি কি মারণরোগের মতো ছড়িয়ে পড়লো গ্রামে গ্রামেও? ১৯৪৭-এ প্রকাশিত "প্লেগ"-এর প্রাদুর্ভাবও হয়েছিল 'ওরান' নগরে। সে উপন্যাসে ছিল বিচ্ছিন্নতা প্রসূত মহামারীর উপাখ্যান। যদিও তারও আগে ১৯৪২-এই কাম্যু আমাদের জানিয়েছিলেন বিচ্ছিন্ন "আউটসাইডার" মারসো-র জীবন আলেখ্য। অযুত নগর-জীবনের ইতিকথায় কি লেখা আছে টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্নতার কাহিনি? সে সব মনের কথাই কি আছে মনে মনে?

আমরা হয়তো আরও একবার পড়তে পারি "পুতুলনাচের ইতিকথা"। সে উপন্যাসের স্রষ্টা যখন 'শশী'কে শহর থেকে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করান, মুগ্ধ পাঠক তখন সবিস্ময়ে এবং সভয় বিস্ময়ে দেখে, বাংলা সাহিত্যের অভিমুখ প্রত্যাবর্তন করল গ্রাম থেকে শহরে। যদিও অতি সূক্ষ্ম স্তরে প্রস্তুতি পর্বটি সেরে রেখেছিলেন জীবনানন্দ দাশ । জীবনানন্দ যে শহরের ছবি আঁকেন, তা ভরে আছে নামহীন-নাগরিক-মানবী-মানবের ভিড়ে। "পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ" অথবা ক্লান্তিহীন "লাশকাটা ঘর" আমাদের এক "বিপন্ন বিস্ময়" আপন্ন কোরে আলোকপ্রাপ্তির থেকে বহুদূরে এক ক্রমাগত উত্থিত ভীতিতরঙ্গে নিমজ্জমান করে, আমরা দেখতে পাই, "চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন" থেকে বিচ্ছিন্ন "ক্লান্ত প্রাণ এক"-এর হাজার বছরের পরিক্রমা। আমরা বিশ্বাস করতে চাই, "কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে"। "হবে" , এখন তবে নেই। এখন তবে নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতার প্রহরে এক বিগতযৌবন মমিফায়েড অস্তিত্বের ক্লিষ্ট যাপন, শুধুই বিচ্ছিন্নতার প্রতিবেশে "শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়"। লক্ষ্য করার বিষয়, জীবনানন্দের কবিতায় কিন্তু এই নির্বেদ অস্তিত্ব শহর ছাড়িয়ে, এমনকি গ্রামও ছাড়িয়ে বনহংস-বনহংসীর পাখায়ও এঁকে দেয় শাহরিক মৃত্যুর সীলমোহর । "আজকের জীবনের

এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না / থাকত না আজকের জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার"। টুকরো টুকরো মৃত্যুই কি বিশশতকীয় শাহরিক যাপনের কালচিত্র নয়? শহরে, গ্রামে এবং আকাশে? একুশ শতকের দুটি দশক অতিক্রান্ত হবার পরেও সেই কালচিত্র কি আরও কালো মেঘের সঞ্চার করেনি? সময় স্থবির নয়। কিন্তু তার গতি কি তিলোত্তমা বা কল্লোলিনীর দেখা পেয়েছে? নাকি বাড়িয়ে তুলেছে আরও বিবমিশা? পররাষ্ট্র সন্ত্রাস, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, গৃহ সন্ত্রাস, গণধর্ষণ, বৈবাহিক ধর্ষণ, প্রতিশ্রুতি খেলাপে ধর্ষণ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অপুষ্টি, বালিকা বিবাহ, অশিক্ষা, সাম্প্রদায়িক বিভেদ, বর্ণবিদ্বেষ এবং আরও আরও শব্দ; যা প্রাত্যহিক সংবাদ শিরোনাম অথবা যেসব সংবাদ গোপন করে সংবাদ মাধ্যম, সেগুলি কি প্রতিদিন আমাদের বমনেচ্ছা জাগ্রত করে তোলে না? প্রকাশ্যে অথবা একান্ত গোপনে আমরা কি প্রতিদিন নিজের নিজের বমির দাগ ধুয়ে ফেলে "আরেকটি প্রভাতের ইশারায়" কালযাপন করে চলি না? বাস করি না কি শুধুই নিজের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার নির্জনতায়? প্রতিরাত্রেই আত্মবিচ্ছিন্ন, আত্মমেহনেই কি আমাদের শাহরিক আনন্দ নির্ধারিত হয়নি? যে বিচ্ছিন্নতায় আপন্ন হয়ে ভ্যান গখ ১৮৮৯-এ এঁকেছিলেন "স্টারি নাইট" চিত্রাবলী । সেই অনির্বচনীয় সৃষ্টিতে মৃত্যু চিন্তা ধরা পড়েছিল গাঢ় নীল এবং অন্যান্য গভীর গভীর রঙে । এক উন্মাদ শিল্পীর মৃত্যু স্বপ্ন কি তবে উনিশ শতকের শেষ দশকেই আমাদের জানিয়েছিল কবরের রতিমুদ্রার আখ্যান? একে কেউ দয়া করে মরবিড শিল্প বা কবিতা বলবেন না। মনে রাখা দরকার রতিমুদ্রায় সব সময়েই থাকে নিদারুণ জীবনতৃষ্ণা, কবরে আত্মমেহনেও বাঁচার তাগিদ। যে তাগিদে "মেঘে ঢাকা তারা" নীতা গুমরে উঠে বলে, "দাদা আমি বাঁচতে চাই"। প্রতিদিন রাতে স্তব্ধতার স্বাতী নক্ষত্রেরা বলছে "বাঁচতে চাই"। প্রতিদিন মাথার উপরে ব্যপ্ত গাঢ় নীল আকাশ ধরে রাখছে, "স্টারি নাইট"-এর চালচিত্র। আমাদেরও কালচিত্র। জীবনানন্দ বললেন, "কেন মৃত্যু খোঁজও তুমি? চাপা ঠোঁটে বলে দূর কৌতুকী আকাশ", "স্টারি নাইট" কি তার গাঢ় নীল রঙ নিয়ে ভ্যান গখ আর জীবনানন্দকে সমকালীন করে তোলে? মৃত্যুর থেকে বড়ো বিচ্ছিন্নতা-বাহক আর কেউ আছে কি ? সেই অন্তিম এবং পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার ভীতিই কি মত্যুভয় জয় করার দর্শন ও কবিতার জন্ম দেয়? মৃত্যু অমোঘ এ কথা জানার পরেও তথাকথিত শক্তিমানের আধিপত্য বিস্তার-বাসনা দুর্বলের জন্য নিশ্চিত করে, প্রতিদিনের টুকরো টুকরো মৃত্যু। একেই কি বলে মূর্খতা? 'মূর্খ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি মুহ্ ধাতু + খ - ক । অর্থ, মোহপ্রাপ্ত, মুঢ়, অজ্ঞ ইত্যাদি। মোহপ্রাপ্ত মুঢ়তার মিছিলে কি পা মিলিয়েছি আমরা?

সর্বস্ব যখন যায় ভোগবাদী বস্তুকাম আর গৃধ্নু বাসনায়, তখন সৎ সাহিত্যিককে শহর পরিক্রমায় বেরোতেই হয়। রোগের শুরু যেখানে, যেখান থেকে রোগ ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে, সেই অঙ্গে নজর না দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে রোগ নিরাময় হয় না। কবি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে তখন হতেই হয় হেমন্তের অরণ্যগামী পোস্টম্যান । শাহরিক বিচ্ছিন্নতার ভিড় থেকে দূরে কবি দেখতে পান, ''একটা চিঠি হতে অন্য চিঠির দূরত্ব বেড়েছে কেবল / একটি গাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব বাড়তে দেখিনি আমি", দূরত্ব বেড়েছে , ''তেমনই ভুবনছাড়া যোগাযোগের দেশে ভেসে চলেছি কেবলই", ''অমর পাতার ছাপ যেখানে পাথরের চিবুকে লীন" ... মূর্খ ভাবে, তবে কি যোগাযোগের দেশ পেতে ছাড়তে হবে ভুবন? আর ভুবনে থাকবে শুধুই ছিন্ন-ভিন্ন-বিচ্ছিন্ন জীবন ? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই ক্রমাগত মনের কথা মুখে বলার প্রয়াসে, মূর্খ। প্রয়াসে, কারণ তার জন্যে বুদ্ধিমান সমাজ নির্ধারণ করেছে নৈঃশব্দ্যের সংস্কৃতি । এই হলো বিচ্ছিন্নতার মূর্খভাষ্যের গোপন কথা ... অতঃপর পাঠকের বিচারসভায়—

নিবন্ধগুলি লেখায় যাঁদের অগণিত বই, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং বক্তৃতা বারেবারে ঋণী করেছে; অধ্যাপক বিমল কৃষ্ণ মতিলাল, অধ্যাপক অমর্ত্য সেন, অধ্যাপক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, অধ্যাপক অরিন্দম চক্রবর্তী, অধ্যাপক সুদীপ্ত কবিরাজ, অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক দীপেশ চক্রবর্তী, অধ্যাপক প্রদীপ বসু, অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অনিল আচার্য।

বিচ্ছিন্নতা সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি লেখায় উৎসাহ দিয়েছেন, আলোচনা করেছেন সৌমিত্র লাহিড়ী। তিনিই সন্ধান দিয়েছিলেন 'পাভলভ ইনস্টিটিউট' প্রকাশিত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ' বইটির। গ্রন্থটির পাঠ কৃতজ্ঞতা অবশ্য স্বীকার্য।

স্বীকার্য সেই পরামর্শ, যা না পেলে 'বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ-একটি বি-কল্পলোক' প্রবন্ধটি লেখা হতো না।

ক্রমাগত ভাবনা-উদ্রেককারী অর্চিস্মিতা — মূর্খভাষ্যের দায় তাকেও নিতে হবে।

''সংকলিত মূর্খভাষ্য" প্রকাশ করার ঝুঁকি নিলেন যিনি, ''পুনশ্চ"র সন্দীপবাবু পথ চলার শুরু থেকে পাশে থেকে সেই কবে যে বন্ধু হয়ে উঠলেন ... তাঁকে আর কি বলা যায় ... তিনি অবিচ্ছিন্ন।

জানুয়ারি, ২০২২ অনিরুদ্ধ রাহা

বিচ্ছিন্নতার অনুক্রম

বহে নিরন্তর বিচ্ছিন্নতা ধারা : অথ মানবকথা	১৩
"গোপনবাসীর কান্নাহাসি", "ভূতলবাসীর আত্মকথা" এবং 'আমি'	২৪
ছিন্নবন্ধু-ভিন্নবন্ধু—প্রাণে তোমার পরশখানি দিও	৩৬
সংস্কৃতির যাপনচিত্র অথবা নৈঃশব্দ্যের সংস্কৃতি	৫৬
স্মৃতি-সত্তা-সময়—বিচ্ছিন্ন যাপনচিত্র	৭২
'মানবিক দুঃস্বপ্নের' বিচ্ছিন্ন সীমান্তে	৮০
আত্মময় আত্মবিস্মৃতি — বিচ্ছিন্নতার মহামারীর ইতিকথা	৯১
ধর্ম-অবিচ্ছিন্নতা, ধর্মে বিচ্ছিন্নতা	১০৮
সাতরঙা সূর্য বনাম বিচ্ছিন্নতাবাদ	১৩২
"আমার এ ঘর"—"কোথায় পাবো তারে"	১৪২
'অসম্পূর্ণতার উপপাদ্য'—বিচ্ছিন্নতার বৈজ্ঞানিক কাব্য	১৫১
বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ — একটি বি-কল্পলোক?	১৬২

বহে নিরন্তর বিচ্ছিন্নতা ধারা : অথ মানবকথা

বিচ্ছিন্নতা কতদিন বেঁচে আছে পৃথিবীতে? বিচ্ছিন্নতা কি কালিক? বিচ্ছিন্নতাও কি কালের যাত্রাপথে 'চক্রপিষ্ট'? নব নব কালে বিচ্ছিন্নতা কি উদ্‌গত হয় নবকলেবরে ? সেই নব-বিচ্ছিন্নতার গভীরে কি নিহিত থাকে 'বিস্মৃতপ্রদোষে' লীন কোনো বিচ্ছিন্নতার 'অপরিবর্তন অর্ঘ্য'? সময় কোনো স্থাণু সত্যের বাহক নয়। কালপ্রবাহে পরিবর্তিত হয় সত্য। কালপ্রবাহ অর্থ কিন্তু অবিচ্ছিন্ন একটি কালসূত্র নয়। খন্ডিত নব নব কালের অপ্রতিরোধ্য গতিময়তাই কালপ্রবাহ। প্রতিটি নূতন কালে নব নব অনুভব। নিত্য নতুন সত্য। ধাবমান কালের সব নতুন খন্ড বহন করে চলে কালেরই অখন্ডিত উত্তরাধিকার । ইতিহাসের পথপরিক্রমায় মানুষ যে সমস্ত উত্তরাধিকার যুগ থেকে যুগান্তে বহন করে এনেছে, সেই সূত্রে সে কি বিচ্ছিন্নতারও উত্তরাধিকারী? বিচ্ছিন্নতা কি একটি অনুভব নাকি তার আছে কোনো বস্তুগত অস্তিত্ব? মানুষের ইতিহাসে ঠিক কবে থেকে উপলব্ধ বিচ্ছিন্নতা? প্রাগৈতিহাসিক বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস কি স্বীকৃত, নাকি বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস আর মানবমনের উদ্ভব ও বিস্তারের ইতিহাস সমকালিক ? বিচ্ছিন্নতা কি নিতান্তই মানবিক নাকি বিচ্ছিন্নতা এক জাগতিক সত্য? যদি বিচ্ছিন্নতা হয় জাগতিক সত্য, তাহলে তার কি আছে কোনো মহাজাগতিক উত্তরাধিকার? এই শেষ প্রশ্নটির আলোচনা মুলতুবী রেখে আপাতত অনুসন্ধান করা যেতে পারে মানুষের মননকালের সমান্তরাল বিচ্ছিন্নতা প্রবাহের ইতিবৃত্ত।

ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটিতে অদ্বৈতবাদের মূলসূত্র বর্ণিত হয়েছে । ''ঈশাবাস্যমিদং সর্বং''। শঙ্করভাষ্য অনুসারে এর ব্যাখ্যা বিশ্বের সব কিছু ঈশ্বর (ব্রহ্ম) দ্বারা আচ্ছাদিত । এ ব্যাখ্যা নাকি ভাববাদীদের মায়াবাদে প্রবৃত্ত করেছিল। কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন এর অর্থ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আর জগৎ মিথ্যা । এই ভাবনা জীবনবিচ্ছিন্ন । কিন্তু অপর ব্যাখ্যাকারেরা বলেছিলেন এর অর্থ এও হতে পারে যে, এ জগতের সবকিছুতেই ব্রহ্মের বাস । ঈশ্বর সর্বত্র বাস করেন । তার অর্থ দাঁড়ায় মায়াবাদের ঠিক বিপরীত । এই দ্বিতীয় অর্থ স্বীকার করলে যা কিছু জাগতিক তার সবই ঐশ্বরিক । তখন আর বিচ্ছিন্নতার অনুভব নেই । এক অনির্বচনীয় অবিচ্ছিন্নতার অনুভব । রবীন্দ্রনাথ তাঁর ''সাধনা'' বক্তৃতামালায় ''ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ'' বক্তৃতায় বললেন, ''এই ঈশ্বর কি জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবমূর্তি হতে পারেন ? পরিবর্তে এর তাৎপর্য হলো, তাঁকে সবকিছুর মধ্যে দর্শন করা নয়, জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে তাঁকে নমস্কার জানানো"।

একই ভাবের দ্যোতনা বিশ্বের সকল ধর্মভাবনায় । মুন্ডক উপনিষদ তৃতীয় মুন্ডক দ্বিতীয় খন্ড ৫ম শ্লোক জানালো "তে সর্বগতঃ সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরাঃ যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি"। "সাধনা" বক্তৃতামালায় কবি ব্যাখ্যা করলেন এই শ্লোক । "ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ" বক্তৃতায় ঋষিদের সম্বন্ধে বললেন, "তাঁরা সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুক্তাত্মা হয়েছিলেন, সকলের মধ্যে প্রবেশ করে বিশ্বজীবনে আবিষ্ট হয়েছিলেন"। লক্ষ্য করার বিষয়, সকলের সঙ্গে যুক্ত হবার কথা বলা হলো । "যুক্তাত্মা" তো অদ্বৈত তত্ত্বেরই সমার্থক । দ্বৈতের অদ্বৈত অভিমুখে গমনই কি তবে ধর্মের মূল উদ্দেশ্য ? বিচ্ছিন্নতা থেকে অবিচ্ছিন্নতায় অভিগমন ? গভীরতর অর্থে আদিম মানবের বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের অবসানে প্রাগাধুনিক থেকে আধুনিক মনন কি তবে অবিচ্ছিন্নতা অভিসারী ? যে অবিচ্ছিন্নতা "আত্মনো মক্ষার্থম জগত হিতায় চ"। তখনই কি অর্ঘে আর আরাত্রিকে মিশে যায় আজানের সুর? যে ছদ্মধর্মবোধ বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয় তা কি আদতে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী কৃত ধর্মের অসম্মান ও অপব্যাখ্যা?

এইসব ভাবনা কিন্তু একটি সত্য প্রতিষ্ঠা করে। বিচ্ছিন্নতা মানব প্রজাতির সত্তার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট এক বিষয়। তা যদি না হতো, তাহলে কেন সেই আদিমনীষার যুগ থেকে অবিচ্ছিন্নতার আকিঞ্চন ? যুগে যুগে কেন বারে বারে বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আলোচনা? সময় পাল্টেছে, আঙ্গিক পাল্টেছে কিন্তু বিষয়টি থেকে গেছে ।

শব্দটির অনুভবের লিখিত দলিল, ৩৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মহাকবি কালিদাস রচিত মেঘদূতের ১২০টি স্তবকের ছত্রে ছত্রে। অনুভবেই তো বিধৃত থাকে মানবিক স্বীকৃতি। মেঘদূত রচনার বহু আগে, বিস্মৃত অতীতে, বিছিন্নতার অনুভব, দেশে দেশে রচিত নানান মহাকাব্যিক চরিত্র নির্মাণের গভীরতর শর্ত। সে অনুভব শুধুই ব্যক্তির, এ কথাও ভাবার হেতু নেই । ব্যক্তির অনুভব নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠলে তবেই তো রচিত হয় মহাকাব্য । মহাকাব্য তো মানবিক অনুভবের অক্ষরে লেখা, তার পাপ ও পতনের স্বীকারোক্তি। যদিও স্বীকারোক্তির মূল্যে স্বর্গযাত্রা, পুনঃপতনের প্রতিবন্ধক হয় না। সে ইতিহাস ধারণ করেই সাহিত্যের আঙিনায় মানব মনের বিচ্ছিন্নতা পীড়ার স্বরূপ সন্ধান এক ধারাবাহিক সাধনা। রবীন্দ্রনাথ যখন ঊর্মিলা, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা এবং চিত্রলেখাদের নিয়ে "কাব্যের উপেক্ষিতা" নিবন্ধ রচনা করেন, তখন এই উপেক্ষা কি মহাকাব্যের নায়কদের পাপসঞ্জাত বিচ্ছিন্নতার নামান্তর নয়?

রবীন্দ্রনাথ সাতটি কবিতা রচনা করেছেন 'বিচ্ছেদ' শিরোনামে (তার মধ্যে একটি অনুবাদ কবিতা)। সে সবই বিচ্ছেদের নৈর্ব্যক্তিক ভাবনা। বিচ্ছেদ-ভাবনার অনুষঙ্গ তো রবীন্দ্রকাব্যের পাতায় পাতায়, রবীন্দ্রগানের সুরে সুরে। তাঁর একতারাটির একটি তার, যে সুরের বেদন বইতে পারে না, সে তো সেই বিচ্ছিন্নতা-ভাবনা, যার অনুভবে কবি বিজনঘরে নিশীথ রাতে প্রতীক্ষারত। সে তো সেই, যে তাঁর হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিল,

দেখতে পাননি যাকে। কবির এ বোধ ঔপনিষদিক বিচ্ছিন্নতা ভাবনায় জারিত। সেই বোধই কি তবে দ্বৈত থেকে অদ্বৈতে অভিগমন? পরম সাধনাতেও কি সম্ভব সে অভিগমন? নাকি যখন "ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা", তখনই "আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন", এই সত্যই অনন্ত প্রেমপ্রবাহের উৎস? "মর্তে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্তমিশ্রিত প্রেমধারা"। কবি কি আমাদের জানালেন যে বিচ্ছিন্নতা, কম্পমান প্রাণ আর শঙ্কিত অন্তরের অনিশ্চয়তাই প্রেমের গর্ভগৃহ? "যাহারে পেয়েছি তারে কখন হারাই", এই ভাবনাই কি মানবপ্রেমের মূলসত্য? নিরবিচ্ছিন্ন শঙ্কাহীনতা এবং বিচ্ছেদহীনতার গভীরতর অর্থ মৃত্যু অর্থাৎ সমাপ্তি? যে অবস্থায় আর বলা চলে না "আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব"!

দর্শন এবং সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত করে বিচ্ছিন্নতা, আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ভাবনার অবিচ্ছিন্ন অংশ। 'Aliénation', ফরাসী ভাষায় অ্যালিয়েনেসজঁ শব্দটির সমাজতাত্ত্বিক তথা রাজনৈতিক অনুষঙ্গে সর্বপ্রথম ব্যবহার সম্ভবত ১৭৬২তে লিখিত রুশোর "দ্য সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট" বইটিতে পাওয়া যায়। শব্দটির ইংরাজি অর্থ alienation।যার বাংলা বিচ্ছিন্নতা। ১৭৫৫ সালে লেখা "Discourse on the Origins of Inequality" গ্রন্থে, রুশো আদিম অবস্থা থেকে আধুনিক ও জটিল মানব সমাজের বিবর্তনের এক বহুস্তরীয় প্রকরণের কল্পনা করেছিলেন। এই কল্পিত বিবর্তনের প্রতিটি স্তরে মানুষের পারস্পরিক বস্তুগত এবং মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তিত হয় তাদের নিজেদের সম্পর্কে ধারণা। স্বভাবতই পাল্টাতে থাকে যুগসত্য । রুশো একে বলেন "Sentiment of their existence"। এ তত্ত্ব অনুসারে আদতে আদিম মানুষ ছিল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ।প্রজাতিগত ভাবে এমনটিই নাকি ছিল তার ধর্ম (স্বাভাবিক প্রবনতা)। ছিল না বস্তুগত কারণে পারস্পরিক সৌহার্দের প্রয়োজন। তারা মিলিত হতো শুধুই প্রজননের তাগিদে। এমনকি শিশুপালনও ছিল অত্যন্ত স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য । অপরাপর প্রজাতির সঙ্গে পার্থক্য ছিল তাদের স্বাধীনতা বোধ এবং পূর্ণতা অর্জন বাসনায় (রুশো বললেন "freedom and perfectibility")। স্বাধীনতা অর্থাৎ শুধুমাত্র ক্ষুধা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হওয়া । আর পূর্ণতা অর্জন বাসনা অর্থাৎ প্রয়োজন নিরসনের জন্য নব নব উন্নততর প্রকরণের সন্ধান । আশ্চর্যজনক ভাবে রুশোর এই কল্পনা কি তবে ধ্বনিত করলো বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ-এর প্রথম শ্লোকটি? "নৈবহ কিঞ্চনাগ্র আসীন্মৃত্যু নৈবেদমাবৃতমাসিৎ। অশনায়য়াহশনায়া হি মৃত্যুস্তন্মনোহকুরুতাত্মন্বী স্যামিতি"। অর্থাৎ, পূর্বে এই জগৎ শুধুই ক্ষুধারূপ মৃত্যুর দ্বারা আবৃত ছিল। কারণ বুভুক্ষাই মৃত্যু। এই অবস্থায় আমি আত্মবান, অন্তঃকরণবান, সমনস্ক হব, এই উদ্দেশ্যে (সেই মৃত্যু) কার্যপর্যালোচনাক্ষম সংকল্পলক্ষণ বিশিষ্ট মন সৃষ্টি করলেন। ক্ষুধারূপ মৃত্যু থেকে অন্তঃকরণ অভিমুখে মানব যাত্রাপথের একটি মানচিত্র রচিত হলো

কি একটিমাত্র শ্লোকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে? একেই কি তবে বলে ঔপনিষদিক প্রজ্ঞা? কিন্তু কেন প্রয়োজন হলো মনের? বৃহদারণ্যক উপনিষদ প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ-এর চতুর্থ শ্লোক জানালো "সোহকাময়ত দ্বিতীয় ম আত্মা জায়েতেতি স মনসা বাচং মিথুনং সমভবদশনায়া মৃত্যুস্তদ্ যদ্রেত আসীৎ সংবৎসরোহভবৎ"। তিনি কামনা করলেন, আমার দ্বিতীয়স্থানীয় শরীর হোক। তাই মনের সঙ্গে বাক্যের মিথুন হলো। কিন্তু কেন এ উপাচার? বৃহদারণ্যক উপনিষদ প্রথম অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ-এর তৃতীয় শ্লোক বলল, "স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে সদ্বিতীয়মৈচ্ছৎ"। একা একা রমণ করা যায় না, আজও কেউ একাকী থাকলে সুখী হয় না। তাই প্রয়োজন হলো দ্বিতীয়ের।

উপনিষদে কি ধ্বনিত হয়েছিল Social Contract Theory-এর মূলসূত্র? একা থাকার স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব করে সম্মিলিত হয়ে সমাজশৃঙ্খলার অভিমুখে যাত্রা করার সামাজিক চুক্তি কি এইভাবেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন ঋষিরা? বৃহদারণ্যক উপনিষদের রচনাকাল আনুমানিক ১০ম থেকে ৫ম খৃস্টপূর্বাব্দ। প্লেটোর রিপাবলিক অনুসারে Social Contract Theory-এর প্রথম প্রবক্তা অ্যারিস্টন পুত্র এথেনিয়ান গ্লাউকন বা গ্লকন । সময়টা ৪র্থ খৃস্টপূর্বাব্দ। প্লেটো লিখিত "Crito" নামক গ্রন্থে সক্রেটিস এবং তাঁর বন্ধু ক্রীটো-র যে সংলাপ লিপিবদ্ধ আছে সেইখানেও Social Contract Theory উল্লেখিত হয়েছে। প্লেটোর সময় খৃস্টপূর্বাব্দ ৪২৭ থেকে ৩৪৮ । প্রায় ১৫০ বছর পার করে খৃস্টপূর্বাব্দ ২য় শতকে বৌদ্ধ লোকোত্তরবাদী দার্শনিক গোষ্ঠী তাঁদের "মহাবস্তু" পুঁথিতে 'মহাসম্মতা'-র কথা বললেন। মহাসম্মতা — consent of the mass।

ইতিহাসের ধারায় সর্বসম্মতির ভাবনার পরিক্রমা এসে পৌছাল আধুনিক বিশ্বে টমাস হবস-এর সময়ে । ১৬৫১তে "লেভাইথান" গ্রন্থে হবস সমাজ এবং আইনসঙ্গত সরকারের গঠন বর্ণনা প্রসঙ্গে Social Contract Theory-র বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। যদিও ১৬৮৯ এ জন লক প্রণীত "Second Treatise of Government" গ্রন্থ হবস-এর ভাবনার থেকে প্রভূত মৌলিক বৈসাদৃশ্য সূচিত করেছিল। পাঠকের কৌতুহল উদ্রেকের উদ্দেশ্যে গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের সামান্য অংশ উদ্ধৃত হলো :

"Sect 1. এটি পূর্বোক্ত বক্তৃতাটিতে প্রদর্শিত হয়েছে,

(১) যে, আদম পিতৃত্বের স্বাভাবিক অধিকার দ্বারা বা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত সদর্থক দান দ্বারা বাচ্চাদের উপর এই জাতীয় কোনও কর্তৃত্ব বা বিশ্বব্যাপী কর্তৃত্বের অধিকার পায়নি যেমনটা ভাবা হয়ে থাকে

(২) যদিবা এহেন অধিকার তার থাকে তবে তার উত্তরাধিকারীরা এহেন অধিকারের উত্তরসূরি নয় :

(৩) তার উত্তরাধিকারীদের যদিবা এহেন উত্তরাধিকার থাকত তাহলেও প্রকৃতির কোন বিধি বা ঈশ্বরের ইতিবাচক আইন দ্বারা, কে সর্ব বিষয়ে তার যথাযথ উত্তরাধিকারী,

সে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে এবং উত্তরাধিকারের যথার্থ অধিকার এবং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিধি অবশ্যই নির্ধারণ করা যেত না"[১]।

হবস যখন বলছেন প্রায় পরম-কর্তৃত্বর কথা, লক বললেন আইনের ভিত্তিতে অক্ষত স্বাধীনতার তত্ত্ব ।এ সবই ঘটছে রুশোর জন্মের প্রায় ২৫ থেকে ৫০ বছর আগে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে প্রায় বিস্মৃত অতীত (১০ম খৃস্টপূর্বাব্দ) থেকে আধুনিক (১৬৮৯ খৃস্টাব্দ) প্রায় আড়াই হাজার বছর ব্যাপ্ত সময়ে, সকল দার্শনিক এবং চিন্তাবিদ একক মানুষ থেকে সামাজিক মানুষের ভাবনায় নানান আলোচনা করেছেন । সুতরাং একথা আজ স্বতঃসিদ্ধ যে মানব ইতিহাসের স্বাভাবিক অভিগমন বিচ্ছিন্নতা থেকে অবিচ্ছিন্নতা অভিমুখে ।একথাও হয়ত স্বতঃসিদ্ধ যে এই অভিগমনের গভীরে আছে মানব প্রজাতির স্বাভাবিক প্রবণতা। স্বাভাবিক শব্দটি হয়তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি ভাবা যায় যে তত্ত্ব, প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করে; কিন্তু তত্ত্ব, প্রবণতার জন্মদাতা নয় । ভাবনার পরিধি বিস্তৃত হওয়ার সুবাদে এ ভাবনার বিপ্রতীপেও কিন্তু ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটল। সত্যই কি তত্ত্ব, প্রবণতার দিক নির্দেশে মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে না?

তাত্ত্বিকরা বলছেন, পারে বইকি। সভ্যতার অগ্রগতি একক বিচ্ছিন্ন মানুষকে সমাজ-অবিচ্ছিন্ন করে তুলতে লাগলো ক্রমশ। কিন্তু সে কি সত্যই তার স্বাভাবিক প্রবণতা? নাকি তার স্বাভাবিক প্রবণতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলার কোনো প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছিল অপেক্ষাকৃত অধিক বুদ্ধিমান ও শক্তিমান কিছু মানুষ? অগণিতের উপর কি ছিল মুষ্টিমেয়র দৃঢ়মুষ্টি? রাজনৈতিক দর্শনের ব্যাখ্যাকারেরা অনেকেই তো তেমন সত্যদর্শন করিয়েছেন। বলেছেন দীক্ষিতকরণ (indoctrination) এবং অভিভাবন (suggestion)-এর কথা[২]। দীক্ষিতকরণ অর্থাৎ কোনো মতের অনুগামিতা এবং মতবাদের প্রতি বিশ্বাস। আর মনোবিজ্ঞানের শব্দ, অভিভাবন অর্থাৎ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মনে পরিকল্পিত ভাবে নির্দিষ্ট ধারণা অনুপ্রবিষ্ট করানো। শব্দদুটির অর্থের অভিঘাতে যে দুটি বিষয় মনে আসা অবশ্যম্ভাবী, তার একটি ধর্ম(Religion) এবং অপরটি রাজনীতি। দীক্ষিতকরণ এবং অভিভাবন ব্যতিরেকে ধর্ম বা রাজনীতি কি অস্তিত্বহীন? মতের অনুগামিতা এবং নির্দিষ্ট ধারণা পরিকল্পিতভাবে মানুষের মনে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া ব্যতিরেকে কোনো ধর্ম বা রাজনৈতিক মতাদর্শ কি সামাজিক বিবর্তনের সাপেক্ষে যোগ্যতমের উদ্বর্তনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে? ধর্ম ও রাজনীতি টিঁকে থাকতে মানুষের মনে ভাইরাল হতেই হয়। তাহলে তত্ত্বই কি বিচ্ছিন্ন থেকে অবিচ্ছিন্নতার অভিমুখে মানব-প্রবণতার গমনের দিকনির্দেশক? দীক্ষিতকরণ এবং অভিভাবন কি তবে সেই দিকনির্দেশের ক্ষেত্র প্রস্তুতের মূল হাতিয়ার? একটি অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনার দাবী হয়তো রাখে বিষয়টি।

সমাজচিন্তকরা মনে করছেন সহজাত প্রবৃত্তির বাইরে মানুষ যা কিছুই করে, তার পিছনে থাকতে পারে তিনটি কারণ। স্বার্থসিদ্ধি, শাস্তির ভয়, দীক্ষিতকরণ[৩]। এই তিনটি